প্রবাহ
একটি আন্তশৃঙ্খলামূলক ই-পত্রিকা
ই-পত্রিকা ওয়েবসাইট :
https://www.vivekanandacollegeforwomen.org/ejournal-bengali

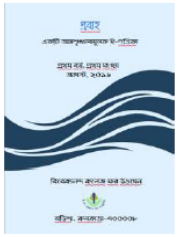

মুক্তধারা : সমকালীন পরিবেশ এবং বর্তমান যুগে তার প্রাসঙ্গিকতা

সুনন্দা ঘোষ, অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

Abstract:

In 1942, Rabindranath wrote the "Muktadhara". Just at the same time Mahatma Gandhi started his "Non-cooperation Movement" which, however, had to be withdrawn by him due to wrong behavior by a group of unruly mob.

Rabindranath emphasized the need for the development spiritual power and the dawning of good sense among all sections of the people. He gave his ideas an imaginary form in his drama "Muktadhara". Here the poet is of opinion that everyone is free to obtain and use water which flows freely.

In the present day, the intrinsic ideas of "Muktadhara" might have an impact upon the demonstrators of the non-violent "Save Narmada Movement".

যেকোনো রচনার পিছনে কোনো না কোনো একটা প্রেরণা কাজ করে যা কখনো আনন্দদায়ক বা বেদনাতুরও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত রচনার পশ্চাতেই এইরকম কোনো প্রেরণা কাজ করেছে যা তাঁর রচনায় ব্যক্ত হয়েছে। কখনো প্রত্যক্ষ ভাবে ঘটেছে, কখনো বা প্রচ্ছন্নে। আলোচ্য 'মুক্তধারা' নাটকটিও তার ব্যতিক্রম নয়। নাটকটির মন্ত্রকথা বুঝতে হলে একটু ইতিহাস চর্চার প্রয়োজন আছে।

১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মুক্তধারা' নাটকটি রচনা করেন। ঠিক এই সময়ই মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতে বিশেষ প্রভাব ফেলে। আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা গ্রামের জনতা থানার সম্মুখে হাজির হলে পুলিশ তাদের উপর গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গে জনতা উত্তেজিত হয়ে থানায় আগুন লাগিয়ে দেয়। এই ঘটনায় গান্ধীজী ব্যথিত হন এবং হতাশ হয়ে অসহোযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। গান্ধীজী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত করে এবং তারই ফলস্বরূপ 'মুক্তধারা' নাটকটি রচিত হয়।

সেদিনের ভারতবর্ষের মানুষ অহিংস আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তিনি আরো বুঝেছিলেন যে সেই সকল মানুষের আত্মিক শক্তির জাগরণ, শুভবুদ্ধির উদ্বোধন সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। তাই গান্ধীজীর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা থাকলেও

তার আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। এরকম এক মানসিক অবস্থায় মানবতাবাদী কবি, মুক্তিকামী কবি মনে মনে যা ভেবেছিলেন, তারই একটি কাল্পনিক রূপ দিলেন তাঁর 'মুক্তধারা' নাটকে।

১৯০৯ সালে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে আমরা ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রটিকে পাই, যাঁর মধ্যে গান্ধী আদর্শের প্রত্যক্ষ ছাপ পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালের 'মুক্তধারা' নাটকেও গান্ধীজীর আদর্শায়িত চরিত্র সেই ধনঞ্জয় বৈরাগীকেই দেখি, যিনি গান্ধীজীর মতো কখনোই বিপদ দেখে সরে দাঁড়ান নি। নাটকে দেখা যায় তিনি রাজা রণজিতের সম্মুখে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে গান্ধীজীর মতোই শান্তভাবে, স্বইচ্ছায় বন্দী হতে চেয়েছেন। তিনি রাজার সম্মুখে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন - ' যেটা তোমার নয়, তা তোমাকে দেবনা।' পরস্বহরণকারী শাসক সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করেছেন অবলীলায়। নাটকে দেখা যায় রাজা রণজিৎ যখন রাজস্ব আদায় করতে পারলেন না, থখন ধনঞ্জয়কে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেন এবং তার ফলে শিবতরাইয়ের মানুষেরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন - 'মার জিনিসটাকেই একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাও।' আবার পরে বলেছেন - 'মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগছেনা অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।' ধনঞ্জয় বৈরাগীর এ হেন সংলাপ কি গান্ধীজীর অহিংসার কথা বলে মনে হয় না ?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে জাপান,আমেরিকা পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা, পশ্চিম মহাদেশের নানা সমস্যা, বিশেষ করে যে উগ্র জাতীয়তাবাদ তিনি দেখেছিলেন 'মুক্তধারা' নাটকে তারই শৈল্পিক প্রতিবাদ লক্ষ্যনীয়। 'জাপান যাত্রী'-তে তিনি লিখেছিলেন - ''সমুদ্রের তীরে তীরে বন্দরে বন্দরে মানুষের লোভ কদর্য ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ করছে।'' মানুষ মানুষের ক্ষতিসাধন করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করছে। মানুষের এই লোভ তিনি সহ্য করতে পারেন নি, ব্যথিত হয়েছেন। আলোচ্য নাটকেও সেরকমই ছবি দেখা যায়, যেখানে রাজা রণজিৎ শিবতরাইয়ের প্রজাদের স্ববশে আনার জন্য, তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য শিবতরাইয়ের প্রাণস্বরূপ মুক্তধারার মুক্তজলে বাঁধ বেঁধেছেন। যন্ত্ররাজ বিভূতি এই বাঁধ নির্মাণ করেছেন। তাঁকে এই যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিভূ বলেই মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রকে মেনে নিয়েছেন, বিজ্ঞানকেও তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞানের অপব্যবহার বা যন্ত্রের পাশবিক দাপট মেনে নিতে পারেন নি যা মানুষের পক্ষে সুখকর ছিলনা। বিজ্ঞান যেখানেই প্রকৃতির স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম করেছে সেখানেও তার সুদুরপ্রসারী প্রভাব মানুষের অনুকূলে যায়নি। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কবি একথা বহুবছর আগেই অনুভব করেছিলেন। 'মুক্তধারা' নাটকটি রচনার প্রায় দশ-এগারো বছর পরে গড়ে ওঠে পৃথিবীর সর্বপ্রথম বহুমুখী নদী পরিকল্পনা আমেরিকার টেনিসি ভ্যালি অথরিটি। নদীর প্রবহমান জলকে বাঁধ দিয়ে সংরক্ষণ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন, জলসেচ, কৃষি ইত্যাদি উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যবহার করা ছিল এর উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর প্রথম যে বহুমুখী নদী পরিকল্পনা গড়ে ওঠে তা টেনিসি ভ্যালি অথরিটির অনুকরণে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন। তারপর ভারতে পরপর নদীকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে জলাধার নির্মাণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রন, সেচের সাহায্যে কৃষির উন্নতি ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে জোড় দেওয়া হয়। কিন্তু তার ফলে আজ অতিরিক্ত সেচ সিক্ত রুক্ষ উত্তর পশ্চিম ভারতের জমি লবনাক্ত ও রুক্ষ, এমনকি নদীপথ অবরুদ্ধ প্রয়োজনীয় জলের অভাবে। বন্যা আজো হয়, নিয়ন্ত্রণ তো দূরের কথা, আরো ভয়ানক এবং অযাচিত সময়ে হয়। নদীপাড়ের অধিবাসীরা নদীর চলার ছন্দে মিলিয়ে নেয় তাদের জীবন, সেটাই স্বাভাবিক ও কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু যখন বিজ্ঞানের নামে, উন্নয়নের নামে এই স্বাভাবিকতা নষ্ট করা হয় তখনই মানবসভ্যতা প্রকৃতির করাল গ্রাসের শিকার হয়ে পড়ে। প্রকৃতি ধারণ করে রুদ্ররূপ। বহুদর্শী রবীন্দ্রনাথ এই যন্ত্রসভ্যতার কুটিল রূপটিকেই তার নাটকে তুলে ধরেছেন যন্ত্ররাজ বিভূতির যন্ত্রশক্তির আস্ফালনের মাধ্যমে।

'মুক্তধারা' নাটকটির মধ্যে যে কাহিনীটি ব্যক্ত হয়েছে তা পাঠ করে মনে হতে পারে এটি রবীন্দ্রনাথের যন্ত্রবিরোধী আন্দোলনের বিশেষ আহ্বান। বিশেষ করে বর্তমান কালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমাদের এখনো মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথের এই নাটকটি আজও কতটা প্রাসঙ্গিক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই নাটকটি যন্ত্রবিরোধীতার বার্তাবাহী। কিন্তু যন্ত্র মাত্রেরই বিরোধিতা এখানে করা হয়নি। যে যন্ত্রের চাপে মানবজাতির মনুষ্যত্ব ক্লিষ্ট, সেই যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।বাঁধ নির্মাণের ফলে মানুষের যে জলকষ্ট, যে অস্তিত্বের সংকট, তা আমরা এখনো প্রত্যক্ষ করি। বাঁধ নির্মাণের কাজ এখনো প্রতিনিয়তই ঘটে চলছে। প্রসঙ্গক্রমে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কথা বলা যেতে পারে। পশ্চিম ভারতের প্রধান নদী নর্মদা উপত্যকায় ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতম অধিবাসীদের হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। এই নদীর স্রোতপথে বাঁধ নির্মাণের জন্য ১৯৮৫ সালে বিশ্বব্যাংক ৪৫ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করে এবং ১৯৮৮ সালে পূর্ণমাত্রায় কাজ সুরু হয়। এই বাঁধ তৈরির ফলে যে হাজার হাজার মানুষের কয়েক প্রজন্মের বাসস্থান ও কর্মস্থল এবং তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি নিমজ্জমান হবে। এইরকম পরিস্থিতিতে প্রকল্পটির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন বিখ্যাত পরিবেশবিদ মেধা পাটেকর এবং বাবা আমতের নেতৃত্বে হাজার হাজার আন্দোলনকারী ।তাঁদের মতে প্রকল্পের পরিকল্পনার সঙ্গে বাস্তবতার অনেক অসঙ্গতি আছে। বনভূমি জলমগ্ন হবে, উর্বর কৃষিজমি ধ্বংস হবে, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হবে, যাদের বেশিরভাগই দরিদ্র এবং আদিবাসী শ্রেনীর। তাদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন নিয়েও উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে প্রকল্পটির রূপায়ণে লাভের তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি। ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের যে গ্রামগুলি ডুবে যাবার আশঙ্কা প্রায় দশ হাজার মানুষ জমা হয়েছিলেন প্রকল্পটি রূপায়ণের প্রতিবাদ জানাতে এবং সেই অহিংস মিছিলকে পুলিশ আক্রমণ করে। দেশের চিন্তশীল বুদ্ধিজীবীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বলা প্রয়োজন। হিমালয়ের পাদদেশে ভাগীরথী ও ভিল গঙ্গা নদীর সংযোগস্থল তেহরী বাঁধ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুন্দরলাল বহুগুণা এই বাঁধের বিরোধিতায় বেশ কয়েকবার অনশন করেন। এখানেও তীব্র জলসঙ্কট দেখা দিয়েছিল। বিশ্বের তথা সমগ্র ভারতবর্ষে এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাওয়ার যে লড়াই তা ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে সমগ্র শিবতরাইয়ের প্রজাদের বাঁচার লড়াইয়ের সমতুল্য নয় কি!!!!